উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়দাদা মহাশয়ের

শ্রীচরণ কমলে—

প্রকাশক,
শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চৌধুরী।
২০ নং মে-ফেয়ার,
বালিগঞ্জ।
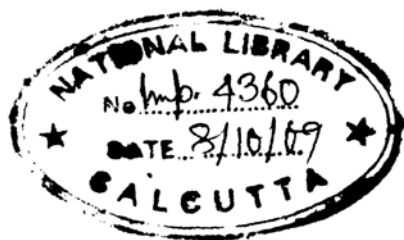
কলিকাতা
উইক্‌লী নোট্‌স্ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৩০ সাল।
মূল্য ২৲ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে পাঠকদের হস্তে সমর্পিত হইল। ইহার গুণদোষ পরীক্ষা তাঁহাদের উপরেই ন্যস্ত। এই অগ্নিপরীক্ষায় আমি যদি উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। যেমন কবি কালিদাস বলিয়াছেন, লেখক যতই শিক্ষিত হউক না কেন, সুধীগণের সন্তোষ হওয়া পর্য্যন্ত আপনার প্রতি অবিশ্বাস তাহার মন হইতে কখনই অপনীত হইবার নহে—

অপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥

শকুন্তলা।

কমলালয়।
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।
১৫-৭-১৯২২।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌদ্ধধর্ম্ম।

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিসসং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখাজাতি পুনপ্পুনং
গহকারক! দিট্‌ঠোহসি, পুন গেহং নকাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।

জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ,
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর।
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চূরমার গৃহ-ভিত্তিচয়,
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

বুদ্ধদেব।

সূচী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পৃষ্ঠা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

মুখপত্র।

(১)

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"—পুরাকালে ভারতবর্ষে কোটি কোটি লোক এই মন্ত্র উচ্চারণ করে' বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হত। কিন্তু এই ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম কালক্রমে ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বুদ্ধ কে, তাঁর ধর্ম্ম কি, বৌদ্ধ-সঙ্ঘই বা কি, এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের মধ্যে কোটিতে একজনও দিতে পারতেন না; কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের এই ত্রিরত্নের স্মৃতি পর্য্যন্ত এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। "বৌদ্ধ" এই শব্দটি অবশ্য আমাদের ভাষায় ছিল, এবং বৌদ্ধ অর্থে আমরা বুঝতুম—একটি পাষণ্ড ধর্ম্ম মত; কিন্তু উক্ত পাষণ্ড মতটি যে কি, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনরূপ ধারণা ছিল না।

সংস্কৃত সাহিত্যে অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ আছে; কিন্তু তার কোন বিবরণ নেই। আছে শুধু সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রে এ মতের খণ্ডন। সে খণ্ডন হচ্ছে বৌদ্ধ-দর্শনের। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, বাঙলা দেশে যাঁরা দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা করতেন, সেই পণ্ডিতমণ্ডলীও বৌদ্ধ-দর্শন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেন। সর্ব্বাস্তিবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ, অথবা ভাষান্তরে সৌতান্ত্রিক মত, বৈভাষিক মত, যোগাচার মত ও

মাধ্যমিক মতগুলি) যে কি, সে সম্বন্ধে অদ্যাবধি এ দেশের পণ্ডিত সমাজের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। শঙ্করাচার্য্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে' বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ। কিন্তু যিনি হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জন্ম-দাতা এবং ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদকর্ত্তা বলে জগৎ-বিখ্যাত, তাঁর বিরুদ্ধে এ অপবাদ যে কেন দেওয়া হয়েছে, তা জানতে হলে, শঙ্করের জ্ঞানবাদের সঙ্গে বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদের সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ, তা জানা চাই; যা এ দেশের অধিকাংশ দর্শন-শাস্ত্রীরা জানেন না। এখন এই বৌদ্ধ-দর্শন বুদ্ধের দর্শন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং বৌদ্ধ-দর্শনের বিচার থেকে বুদ্ধদেবের, তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মের এবং তাঁর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই দুদিন আগে আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম।

(২)

আর আজ আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে প্রধানত বৌদ্ধযুগের ইতিহাসই বুঝি—আর হিন্দু কলাবিদ্যা বলতে বৌদ্ধ কলাবিদ্যাই বুঝি। আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করেছি যে, ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগ হচ্ছে এ দেশের সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব-মণ্ডিত যুগ। তাই বৌদ্ধ-সম্রাট অশোক এবং তাঁর অমর কীর্ত্তির দিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তার পর আমরা সম্প্রতি এও আবিষ্কার করেছি যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষরা সব বৌদ্ধ ছিলেন; বাঙলা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি অগ্রগণ্য

ধর্ম্মক্ষেত্র ছিল। বাঙলা ভাষার আদি পদাবলী নাকি বৌদ্ধ-দোঁহা ও আদি ধর্ম্মগ্রন্থ "শূন্যপুরাণ"। এ যুগের পণ্ডিতদের মতে বাঙলা ভাষার ধর্ম্মশব্দের অর্থ বৌদ্ধধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মপূজা মানে বুদ্ধপূজা। বাঙলা ভাষায় যে সকল ধর্ম্মমঙ্গল আছে, সে সবই নাকি বৌদ্ধ-গ্রন্থ। এবং ময়নামতীর উপাখ্যান বৌদ্ধ-উপাখ্যান। কবিকঙ্কন চণ্ডীতেও বুদ্ধের স্তব আছে। তারপর আমাদের অধিকাংশ দেবদেবীও নাকি ছদ্মবেশী বৌদ্ধ দেব দেবী। "তারা" যে বৌদ্ধ-দেবতা—তা ত নিঃসন্দেহ। শীতলাও শুনতে পাই তাই! চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবতা বাশুলিও নাকি বৌদ্ধ-দেবতা, আর বাঙলার পাষাণের পিণ্ডাকার গ্রাম্য মঙ্গলচণ্ডী ছিল আদিতে বৌদ্ধস্তূপ। এ অনুমান সম্ভবত সত্য, কেননা, এ সকল দেবদেবী যে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণের স্বগোত্র নয়—অর্থাৎ বৈদিক নয়, তাঁদের বংশধরও যে নয়, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

বাঙালী সভ্যতার বুনিয়াদ যে বৌদ্ধ, হিন্দু স্তরের দু-হাত নীচেই যে বাঙলার বৌদ্ধ-স্তর পাওয়া যায়, আজকের দিনে তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। বাঙলা দেশের মাটী দু-হাত খুঁড়লেই আমরা অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ-মন্দিরের ভগ্নাবশেষের সাক্ষাৎ পাই। সুতরাং যদি কেউ বলে—মুসলমান যুগে বাঙালী হিন্দু হয়েছে, তাহলে সে কথা সত্যের খুব কাছ ঘেঁসে যাবে। যে বৌদ্ধধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই ধর্ম্মই যে আজকাল আমাদের সকল গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে, তারই স্মরণ-চিহ্ন উদ্ধার করাই যে আমাদের পাণ্ডিত্যের

প্রধান কর্ম্ম হয়ে উঠেছে, এটি সত্য সত্যই একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। এ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল কি করে?—ঘটেছে এই কারণে যে, ভারতবর্ষের এই প্রাচীন ধর্ম্মের সঙ্গে বর্ত্তমান ইউরোপ, ভারতবাসীর নূতন করে আবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

(৩)

বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমিতে তার মৃত্যু হলেও, আজও তা কোটি কোটি এসিয়াবাসীর ধর্ম্ম। শ্যাম, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের লোকে আজও বুদ্ধদেবের পূজা করে, ও নিজেদের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলেই পরিচয় দেয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হয় সমুদ্রের, নয় হিমালয়ের অপর পারের দেশসকল থেকেই এ দেশের এই লুপ্ত ধর্ম্মের শাস্ত্র-গ্রন্থসকল উদ্ধার করেছেন, এবং তাঁদের বই পড়েই আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করেছি।

সিংহলেই সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়, আর পণ্ডিত-সমাজে অদ্যাবধি এই সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্মই স্বয়ং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম বলেই গ্রাহ্য।

সিংহলের মঠে মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত বৌদ্ধধর্ম্মের আদি গ্রন্থগুলি সিংহলী ভাষায় নয়, পালি ভাষায় লিখিত। এই পালি ভাষা যে ভারতবর্ষের একটি প্রাকৃত—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; যদিচ সেটি যে ভারতবর্ষের কোন্

প্রদেশের ভাষা, উত্তরাপথের না দক্ষিণাপথের, বঙ্গের না কলিঙ্গের, মগধের না মালবের—সে বিষয়ে পণ্ডিতের দল আজও একমত হতে পারেন নি।

সিংহলে যে শুধু বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষিত হয়েছে, তাই নয়—উক্ত ধর্ম্মের জন্ম-বৃত্তান্ত ও তার সিংহলে প্রচারের ইতিহাসও রক্ষিত হয়েছে। সুতরাং এই সিংহলী শাস্ত্রই হচ্ছে এ যুগের ইউরোপীয় বৌদ্ধ-শাস্ত্রীদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য দলিল। এবং এই শাস্ত্র থেকে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা যে সকল তথ্য উদ্ধার করেছেন—বর্ত্তমান যুগে তাই আমরা বৌদ্ধমত বলে জানি ও মানি।

(৪)

পালি গ্রন্থসকল আবিষ্কৃত হবার কিছুকাল পরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত খানকতক বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থের সন্ধান নেপালে পাওয়া গেল। সে সব গ্রন্থ আলোচনা করে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দেখতে পেলেন যে, সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্ম ও নেপালী বৌদ্ধধর্ম্ম এক নয়। এবং বহুকাল পূর্ব্বে বৌদ্ধমত যে দু-ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ এই দুটি ধারার দুটি বিভিন্ন নাম থেকেই পাওয়া যায়। যে বৌদ্ধমত সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে প্রচলিত, তা "হীনযান" নামে প্রসিদ্ধ; আর যে বৌদ্ধমত নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে প্রচলিত, তার নাম হচ্ছে "মহাযান"। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এই দুটি বিভিন্ন মতের নাম দিয়েছেন—Northern

School ও Southern School। অনেক দিন ধরে এক দলের ইউরোপীয় পণ্ডিতরা "হীনযান"কেই মূল বৌদ্ধমত ও মহাযানকে তার অপভ্রংশ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। ফলে আর একদল পণ্ডিত তার বিরুদ্ধ মত প্রচার করেন। অবশেষে এই পণ্ডিতের তর্কের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে,—উভয় দলই এখন এ বিষয়ে একমত যে, হীনযান ও মহাযান, এ দুয়ের ভিতর বৌদ্ধধর্ম্মের একই মূলতত্ত্ব পাওয়া যায়। এবং অন্যান্য বিষয়ে উভয় মতের এতটা সাদৃশ্য আছে যে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, একই আদি-মত থেকে এই দুটি বিভিন্ন শাখা বিনির্গত হয়েছে।

"মহাযান" মূল বৌদ্ধমতই হোক, কিম্বা তার অপভ্রংশই হোক, সে মত আমাদের কাছে মোটেই উপেক্ষণীয় হতে পারে না। প্রথমতঃ এ শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তারপর চীনে এবং তিব্বতী ভাষায় লিখিত অধিকাংশ বৌদ্ধ-গ্রন্থই সংস্কৃত-গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। উপরন্তু মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে উক্ত ধর্ম্মের রূপান্তর বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সম্যক জ্ঞান লাভ করলে, আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয়-মনের ইতিহাসের জ্ঞানও লাভ করব। আর তখন হয়ত আবিষ্কার করব যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের মৃত্যু হয় নি। ও ধর্ম্মমত উপনিষদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হয়েছে—জ্ঞানের ধর্ম্ম কালক্রমে ভক্তির ধর্ম্মে রূপান্তরিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই

মহাযান-মতের সঙ্গেই অদ্যাবধি আমাদের পরিচয় শুধু নাম মাত্র।

(৫)

আমরা অতীতের যে ইতিহাস উদ্ধার করবার জন্য আজ উঠে পড়ে লেগেছি, সে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস নয়, বৌদ্ধযুগের ইতিহাস—এক কথায় জাতীয় জীবনের বাহ্য ইতিহাস। আমরা যে কাজ হাতে নিয়েছি তার নাম archæology এবং antiquarianism। বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে তার কি নিদর্শন, কি স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে, আমরা নিচ্ছি তারই সন্ধান এবং করছি তারই অনুসন্ধান। আমাদের দৃষ্টি বৌদ্ধযুগের স্তূপ, স্তম্ভ, মন্দির ও মূর্ত্তির উপরেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের বিশাল ক্ষেত্রে মৃত-বৌদ্ধধর্ম্মের বিক্ষিপ্ত অস্থিসকলই আমরা সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়েছি। আর নানা স্থান থেকে সংগৃহীত অস্থিসকল একত্র জুড়ে যদি আমরা কিছু খাড়া করতে পারি, তাহলে তা হবে সুধু বৌদ্ধধর্ম্মের কঙ্কালমাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের আত্মার সন্ধান না নিয়ে তার মৃতদেহের সন্ধান নেওয়ায়, বলা বাহুল্য আমাদের আত্মজ্ঞান এক চুলও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে না। আর বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে যাঁর পরিচয় নেই, তিনি তার দেহের সাক্ষাৎ লাভ করলেও তার রূপের পরিচয় লাভ করবেন না। বৌদ্ধ-স্তূপ তাঁর কাছে একটা পাষাণ স্তূপমাত্রই রয়ে যাবে। ইট কাঠ পাথরে গড়া মূর্ত্তিসকল মূক। তারা নিজের পরিচয় নিজমুখে দিতে পারে না, তাদের পরিচয় লাভ করতে হয়, ভাষায় যা লিপিবদ্ধ আছে তারই কাছে। সুতরাং বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম্ম ও

তাঁর সঙ্ঘের অজ্ঞতার উপর বৌদ্ধযুগের বাহ্য ইতিহাসও গড়া যাবে না। আমরা বৌদ্ধ স্তূপ স্তম্ভ মন্দির মূর্ত্তির মুখে যে কথা সব দিই, সে কথা আমরা বৌদ্ধশাস্ত্র থেকেই সংগ্রহ করি। Sanchi এবং Barhut স্তূপের ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন মূর্ত্তিগুলির অর্থ ও সার্থকতা তাঁর পক্ষে জানা অসম্ভব, যাঁর বৌদ্ধ জাতকের সঙ্গে সম্যক পরিচয় নেই। অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করা আমাদের নব-ঐতিহাসিকদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

(৬)

পূজ্যপাদ ৺সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম" ব্যতীত বাঙলা ভাষায় আর একখানিও এমন বই নেই, যার থেকে বুদ্ধের জীবন-চরিত, তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্র এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজি ভাষায় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের লিখিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ আছে, সেই সকল গ্রন্থের আলোচনা করেই পূজ্যপাদ ঠাকুর মহাশয় এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই "বৌদ্ধধর্ম্মে"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করতে তিনি ৮০ বৎসর বয়েসে এক বৎসর কাল যেরূপ অগাধ পরিশ্রম করেছেন, তা যথার্থই অপূর্ব্ব। দিনের পর দিন, সকাল আটটা থেকে রাত আটটা ন'টা পর্য্যন্ত তাঁকে আমি এ বিষয়ে একাগ্রচিত্তে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে দেখেছি। শেষটা যখন তাঁর শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তখনও তিনি হয় আরাম চৌকীতে নয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিন

(১৯)

এই বইয়ের প্রুফ সংশোধন করতেন। এ সংশোধন শুধু ছাপার ভুলের সংশোধন নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে নতুন নতুন বই পড়ে, তাঁর লেখার যেখানে সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করতেন, তা করতে তিনি একদিনও বিরত হন নি। তাঁর মৃত্যুর চারদিন আগেও তাঁকে আমি "বৌদ্ধধর্ম্মের" প্রুফ সংশোধন করতে দেখেছি।

এই একাগ্র এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থখানি যতদূর সম্ভব নির্ভুল হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ও তার ইতিহাস সমন্ধে পণ্ডিতে পণ্ডিতে এতদূর মতভেদ আছে, এ বিষয়ে এত সন্দেহের এত তর্কের অবসর আছে যে, এ বিষয়ে এমন কথা কেউ বলতে পারবেন না, যা চূড়ান্ত বলে পণ্ডিতসমাজে গ্রাহ্য হবে। যে ধর্ম্মের ইতিহাস আট দশ ভাষার বিপুল সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করতে হয়, বলাবাহুল্য সে ইতিহাসের খুঁটিনাটি নিয়ে বিচার তর্ক বহুকাল চলবে, এবং সম্ভবত তা কোন কালেই শেষ হবে না। তবে সে ইতিহাসের একটা ধরবার ছোঁবার মত চেহারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর এ গ্রন্থে পাঠক সেই চেহারারই সাক্ষাৎ পাবেন।

(৭)

আমি পূর্ব্বে যা বলেছি তাই থেকে পাঠক অনুমান করতে পারেন যে—

আমি শুধু পণ্ডিত-সমাজের নয়, দেশশুদ্ধ লোকের পক্ষে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক মনে

করি। আর আমার বিশ্বাস সাধারণ পাঠক-সমাজ এই গ্রন্থ থেকে অনায়াসে বিনাক্লেশে সে জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারবেন।

এ গ্রন্থ সাধু ভাষায় লিখিত। কিন্তু এ সাধু-ভাষা আজকের দিনে যাকে সাধুভাষা বলে—সে ভাষা নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা যে ভাষার সৃষ্টি করেন, এ সেই ভাষা। এ ভাষা যেমন সরল তেমনি প্রাঞ্জল, যেমন শুদ্ধ তেমনি ভদ্র। এতে সমাস নেই, সন্ধি নেই, সংস্কৃত শব্দের অতি-প্রয়োগ নেই, অপ-প্রয়োগ নেই, দুষ্ট-প্রয়োগ নেই, কষ্ট-প্রয়োগ নেই, বাগাড়ম্বর নেই, বৃথা অলঙ্কার নেই! ফলে এ ভাষা যেমন সুখপাঠ্য, তেমনি সহজবোধ্য।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, বুদ্ধ-চরিতের তুল্য চমৎকার ও সুন্দর গল্প পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। অনৈক জর্ম্মাণ পণ্ডিত Oldenburg বিদ্রূপ করে বলেছেন যে, বুদ্ধচরিত ইতিহাস নয়, কাব্য। এ কথা সত্য। কিন্তু এ কাব্যের মূল্য যে তথাকথিত ইতিহাসের চাইতে শতগুণে বেশী, তা বোঝবার ক্ষমতা জর্ম্মাণ পাণ্ডিত্যের দেহে নেই। এ কাব্য মানুষের চির-আনন্দের সামগ্রী। অতীতে যে বুদ্ধ-চরিত কোটী কোটী মানবকে মুগ্ধ করেছে, ভবিষ্যতেও তা কোটী কোটী মানবকে মুগ্ধ করবে। এ কাব্যের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য পাণ্ডিত্যের কোনও প্রয়োজন নেই, যার হৃদয় আছে ও মন আছে, এর সৌন্দর্য্য তার হৃদয় মনকে স্পর্শ করবেই করবে। যে দেশে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর যে দেশের লোকে তাঁর জীবন-চরিত অবলম্বন করে' বুদ্ধচরিত নামক মহাকাব্য রচনা করেছে—সে দেশও ধন্য,

সে জাতিও ধন্য। আমি আশা করি, বাঙলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই গ্রন্থ থেকে বুদ্ধ-চরিতের পরিচয় লাভ করে' নিজেদের ধন্য মনে করবেন।

১।৬।২৩ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১। বৌদ্ধধর্ম্ম কি ?

ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস মানবধর্ম্মের ভিত্তিভূমি বলিয়া সামান্যতঃ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ্য, খৃষ্টান, মুসলমান ধর্ম্ম, পৃথিবীর প্রধান এই তিন ধর্ম্ম ঐ ভিত্তির উপরে স্থাপিত। কিন্তু ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে, অনাত্মবাদী নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ বিদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া, কোটি কোটি মনুষ্যের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে? আমি এই প্রসঙ্গে বুদ্ধোপদিষ্ট আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের কথা বলিতেছি, পরবর্ত্তী কালে সে ধর্ম্মের আকার প্রকার পরিবর্ত্তনের কথা স্বতন্ত্র। বুদ্ধদেব যে প্রকাশ্যভাবে আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেন তাহা নহে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে তাঁহার ধর্ম্মকে নিরীশ্বর বলা অসঙ্গত বোধ হয় না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ লক্ষণ জানিতে হইলে, "ধর্ম্মচক্রের" উপর স্বভাবতঃ আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কেননা বুদ্ধত্ব লাভের পরক্ষণেই প্রকাশ্য সভায় তাহা বুদ্ধের প্রথম উপদেশ। ইহাতে ঈশ্বর-বিষয়ক প্রসঙ্গের কোন নিদর্শন নাই। ইহা হইতে আমরা যে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করি, তাহার নাম দুঃখতত্ত্ব।

দুঃখ কি?

দুঃখের উৎপত্তি কোথায়?

দুঃখের নিবৃত্তি কিসে হয়?

বুদ্ধদেব এই দুঃখ-নিবৃত্তির যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গ। সে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ, আপনার যত্ন চেষ্টায় সে পথে চলিতে হইবে। সেই পথের যাত্রী যাঁহারা, তাঁহাদের নির্ভর-দণ্ড আত্মপ্রভাব; ইহাতে দেব-প্রসাদের কোন কথা নাই। এই ধর্ম্মচক্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত বুদ্ধদেব সহস্র সহস্র উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি সূত্র-পিটক প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু দু' একটি বাদে তাহাতে ব্রহ্মবিষয়ক কোন উপদেশ নাই; তাঁহার সঙ্ঘের নিয়মাবলীর মধ্যেও দেবার্চ্চনার কোন বিধিব্যবস্থা দেখা যায় না। একটীমাত্র সূত্র আছে, যাহাতে ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনা লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা হইতে তাঁহাকে ব্রহ্মবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করা ঠিক হয় না; সে সূত্রটির নাম "তেবিজ্জ সুত্ত" (ত্রিবিদ্যা সূত্র)।* এই সূত্রে আমরা দেখিতে পাই, প্রচলিত ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মনোভাব কিরূপ ছিল, কি ভাবে তিনি আর্য্যদেবতা ব্রহ্মাকে বৌদ্ধ-মন্দিরে স্থান দান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই সূত্র মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তিনি ব্রহ্মাকে নিমিত্তমাত্র করিয়া, প্রকৃতপক্ষে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ

---

* পরিশিষ্টে এই সূত্র সমালোচিত হইয়াছে।

দিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান গৌণ, নীতিশাস্ত্র উহার মুখ্য বিষয় বলিয়া মনে হয়। তিনি জ্ঞান ধ্যান কিম্বা ভক্তিযোগে ব্রহ্মে পৌঁছিতে যত্নশীল নহেন। ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার নিজের কি ধারণা, ঐ সূত্রে তাহার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। উহাতে যে দুই ব্রাহ্মণ যুবক বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা ব্রহ্মসম্মিলনের প্রয়াসী, কিন্তু ব্রহ্মের সহবাস লাভ বৌদ্ধধর্ম্মের মোক্ষপদ নহে। সে ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য যে নির্ব্বাণমুক্তি,—ব্রহ্মেতে বিলীন হওয়া তাহার অর্থ নহে। নির্ব্বাণ কি?—নির্ব্বাণ শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা দেখা যায়, কিন্তু মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, নির্ব্বাণের অর্থ দুঃখনির্ব্বাণ, অর্থাৎ দুঃখক্লেশের ঐকান্তিক পরিসমাপ্তি। এ অবস্থায় জীব দুঃখযন্ত্রণা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে। বৌদ্ধধর্ম্মের সার উপদেশ এই যে, প্রত্যেক মনুষ্য নিজ কর্ম্মগুণে, নিজ পুণ্যবলে, আত্ম-প্রভাবে, স্বার্থ বিসর্জ্জনে, সত্যোপার্জ্জনে, প্রেম দয়া মৈত্রী বন্ধনে, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলনিদান নির্ব্বাণরূপ মুক্তি লাভের অধিকারী। যে পথে চলিতে হইবে, তাহা বুদ্ধপ্রদর্শিত আষ্টাঙ্গিক ধর্ম্মপথ। গম্যস্থান নির্ব্বাণমুক্তি—সারথী আত্মশক্তি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম নৈতিক জীবনের মধ্যেই বিচরণ করে—তাহার শেষ সীমা দুঃখনির্ব্বাণ। সুতরাং তেবিজ্জ সুত্ত হইতে আলোচ্য বিষয়ের কোন অকাট্য মীমাংসা করা সম্ভব নহে।

জীবাত্মা, পরমাত্মা, সৃষ্টি, পরকাল সম্বন্ধে যে-সকল প্রহেলিকা মানব-হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদয় হয়, বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। তাহার

কারণ এই যে, বুদ্ধদেব এই সকল গূঢ় প্রশ্নের উত্তরদানে বিমুখ ছিলেন। তাঁহার কোন শিষ্য তাঁহার নিকট এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, তিনি কোন উচ্চবাচ্য করিতেন না, মৌনভাব ধারণ করিতেন।

মালুঙখ্যপুত্র যখন এই সকল তত্ত্বের জ্ঞানলাভ মানসে বুদ্ধের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন, তখন বুদ্ধদেব কহিলেন ঃ—

—হে মালুঙখ্যপুত্র, আমি কি কখন তোমাকে বলিয়াছি, তুমি আমার শিষ্য হও, আমি তোমাকে বলিয়া দিব জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, দেহ আত্মা এক কি বিভিন্ন, মৃত্যুর পর তথাগত নবজীবন ধারণ করিবেন কি না? এই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আমি উপদেশ দিব, আমি কি এমন কোন বচন দিয়াছি?

—না, গুরুদেব, তাহা দেন নাই।

—হে মালুঙখ্যপুত্র, তুমি আহত হইয়া চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিয়াছ, তোমার আরোগ্যের উপযোগী যে ঔষধ, তাহা আমি বলিয়া দিয়াছি। আমি যাহা প্রকাশ করি নাই, তাহা অপ্রকাশিত থাকুক; যাহা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহা প্রকাশিত হউক।”

মিলিন্দ-প্রশ্নে যবনরাজ মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী নাগসেনের যে কথোপকথন আছে, তাহাতে বুদ্ধদেবের এই মৌন ভাবের কারণ সমালোচিত হইয়াছে।

নাগসেন কহিতেছেন, “এমন সকল প্রশ্ন আছে, নিরুত্তর থাকাই যাহার উত্তর;—সে সকল প্রশ্ন কি?—না,

জগৎ নিত্য কি অনিত্য ?

দেহ আত্মা এক, কি পৃথক ?

মরণোত্তর তথাগত জীবিত থাকিবেন কি না ?

এই সমস্ত প্রহেলিকা এক পাশে ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইহাদের কোন উত্তর নাই—উত্তরে কোন লাভ নাই। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দানে তথাগত বাক্যব্যয় করিতে উৎসুক ছিলেন না।"

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি জন্মে যে, বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্ম্ম ঈশ্বরবাদ নহে—উহা নীতিমূলক ধর্ম্ম। উপনিষদ যেমন জ্ঞানপ্রধান, আদিম বৌদ্ধধর্ম্ম সেইরূপ নীতি-প্রধান ধর্ম্ম। তবে কি এই নীতিশাস্ত্র বুদ্ধদেবের স্বকপোল-কল্পিত কোন অভূতপূর্ব্ব নূতন ব্যাপার? তাহাই বা কি করিয়া বলিব? ইহাতে এমন কিছু নূতন তত্ত্ব লক্ষিত হয় না, যাহা বুদ্ধযুগের পূর্ব্বে অবিদিত ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ Rhys Davids যথার্থই বলিয়াছেন—

"বুদ্ধযুগের বহুপূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণগণ তত্ত্ববিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রের গূঢ়তম প্রশ্নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন, এবং তাহার মধ্যে কোন না কোন সম্প্রদায়ে যে গৌতমের তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অধিকাংশ মত ইতিপূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার বিশেষত্ব এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি কঠোর তপশ্চরণ, যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা নীতিশিক্ষাকে উচ্চতর আসন দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদের উপদিষ্ট

মতগুলিকে বিধিবদ্ধ আকার দান করিয়াছিলেন। অন্যান্য ধর্ম্মবীরের ন্যায় তিনিও তাঁহার সমসাময়িক প্রভাবের বশবর্ত্তী ছিলেন, এবং তাঁহার দার্শনিক মতবাদ যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।"

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, তবে ব্রাহ্মণ সমাজে বুদ্ধের এত প্রতিপত্তি কেন হইল? তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা স্বধর্ম্ম—বৈদিকধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি কারণে এই নৈতিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বুদ্ধ-পতাকার তলে দলে দলে ছুটিয়া আসিলেন? তাহার অনেকগুলি কারণ আছে—কয়েকটি এই স্থলে সূচিত হইতেছে।

প্রথম, তাঁহার ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম উদারতা।

অক্কোধেন জিনে কোধং
অসাধুং সাধুনা জিনে—

এই যাঁহার গুরুমন্ত্র, যাঁহার নীতিশৈলোপরি 'বিশ্বমৈত্রী' প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার ধর্ম্ম যে জগন্মান্য হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

দ্বিতীয়, যে আকারে ও যে প্রকারে সেই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তাহাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সহজ প্রাঞ্জল গ্রাম্য ভাষা, সময়োপযোগী প্রসঙ্গ, সুযৌক্তিক, সুবোধ্য, প্রাণস্পর্শী, মধুর ভাষণ,—এই সব ছিল তাঁহার সম্বল। তিনি যাহা বলিতেন লোকেরা তাহা আগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করিত, এবং অন্তরের সহিত গ্রহণ করিত।

তৃতীয়, যাহা প্রচার-কার্য্যে বিশিষ্টরূপে ফলদায়ী হইত, তাহা বুদ্ধদেবের নিজত্ব, তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ও অকৃত্রিম সরলতা, তাঁহার চরিত্রমাধুরী, ও মনোমুগ্ধকারী মোহিনী শক্তি। বুদ্ধদেব আপনাতে কোন ঐন্দ্রজালিক দৈবশক্তি আরোপ করেন নাই, অথচ তাঁহার কি এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি ছিল, যাহার গুণে এই ধর্ম্ম এত অল্পকালমধ্যে এত অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচারিত হইল!

শাক্যমুনি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, সে সময়ে বৈদিক পূজার্চ্চনা কতকগুলি জটিল কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই ক্রিয়াকাণ্ডের উপদেশদাতা যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, তাহাদের আধিপত্যের সীমা নাই। তিনি ব্রাহ্মণাধিপত্যের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণদিগের জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণদিগের বাহ্যাড়ম্বরময় ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে, তাঁহার সরল ধর্ম্ম—সত্য, অহিংসা, ক্ষমা, দয়া, মৈত্রী, আত্মসংযম, সদাচার,—প্রচলিত সহজ গ্রাম্য ভাষায়, জাতিকুলনির্ব্বিশেষে আপামরসাধারণ সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন।* তিনি এইরূপ উৎসাহ এবং ওজস্বিতা সহকারে প্রায় ৪৫ বৎসর কাল অযোধ্যা, মিথিলা, বারাণসী, এই সমস্ত রাজ্যে অবস্থিতিপূর্ব্বক স্বমতানুযায়ী

---

* আমি একথা বলিতে চাহি না যে, বুদ্ধদেব প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি যে ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, তাহাতে ফলে তাহাই দাঁড়াইয়াছিল সন্দেহ নাই। শুধু ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান কেন, তিনি সকল প্রকার অভিমানেরই বিরোধী ছিলেন।

ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত থাকেন, এবং অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমের পর দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার হস্তের বীজ লইয়া দেশদেশান্তরে ছড়াইবার জন্য বাহির হইলেন।

তাঁহার জীবনরহস্যে, তাঁহার হৃদয়স্পর্শী মধুর ভাষণে যে কি অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহা তাঁহার জীবনবৃত্তে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়।

২। বুদ্ধ-চরিত।

বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত "ললিত বিস্তর", অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত, মহাবগ্গ, জাতক ও অন্যান্য পালী, সিংহলী, তিব্বতী গ্রন্থে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থে বুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা বিবৃত আছে, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে বুদ্ধজীবনী বিষয়ে যেমন কতক কতক ঐক্য আছে, তেমনি বিস্তর পার্থক্যও লক্ষিত হয়। ঐক্যমূলক ঘটনাগুলি প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সকল গ্রন্থ পরস্পর তুলনা করিয়া বাছিয়া বাছিয়া বুদ্ধের ধারাবাহিক জীবন-কাহিনী যতদূর সংগ্রহ করা সম্ভব, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অতীব যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তাহা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিবরণী তাঁহাদের রচিত চিত্রেরই প্রতিলিপি। *

বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়কালে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ন্যূনাধিক পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে নেপাল ও উত্তরবিহারের মধ্যস্থিত খণ্ড খণ্ড রাজ্যের মধ্যে শাক্যজাতির নিবাসভূমি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, তাহার রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন, তাহার রাজধানী কপিলবস্তু

---

* ৺সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত "বুদ্ধদেব" হইতে আমি এই ভাগ সঙ্কলনে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। মূল সংস্কৃত ও পালী শ্লোকসকল ইহাতে উদ্ধৃত, এই এক মহৎ লাভ।

রোহিণী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত। নদীর এক পারে শাক্যজাতি, অপর পারে কোলজাতি—এই দুই জাতি একই বংশবৃক্ষের শাখা প্রশাখা বলিয়া অনুমিত হয়। কোল-রাজ্যের রাজধানী দেবদহ। এই দুই জাতি নদীর জল লইয়া ও অন্যান্য কারণে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে ছিন্নভিন্ন হইয়া থাকিত, কিন্তু বুদ্ধযুগের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, তাহারা অপেক্ষাকৃত শান্তি সদ্ভাবে বাস করিতেছে—বিবাহসূত্রে তাহাদের আদান প্রদান চলিতেছে। অঞ্জন, যিনি দেবদহের রাজকুমার, তাঁহার কন্যাদ্বয় মায়া ও মহাপ্রজাপতি রাজা শুদ্ধোদনের দুই রাণী। মায়া দেবীর গর্ভে, কপিলবস্তু ও দেবদহের মধ্যবর্ত্তী লুম্বিনী উদ্যানে* বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। শুদ্ধোদন পুত্রের নাম সিদ্ধার্থ রাখিলেন, গৌতম-গোত্রজ বলিয়া সিদ্ধার্থের অপর নাম গৌতম,—প্রথম বয়সে এই তাঁর ডাকনাম ছিল। তা ছাড়া বোধিসত্ব, তথাগত, শাক্যমুনি প্রভৃতি তাঁর উপাধির অন্ত নাই। কালক্রমে আর সব নাম এক "বুদ্ধ" নামে বিলীন হইয়া গেল।

গৌতমের জন্মগ্রহণের সাতদিন পরে মায়া দেবীর মৃত্যু হয়। তখন কুমারের প্রতিপালনের ভার উহার বিমাতা মহাপ্রজাপতির প্রতি অর্পিত হয়।

কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থ গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন, সেখানে তিনি বিশ্বামিত্র নামক উপাধ্যায়ের নিকট চতুঃষষ্ঠি কলা ও অনেকপ্রকার লিপি-রচনা শিক্ষা করেন। সিদ্ধার্থের পাঠ

---

* বুদ্ধের জন্মভূমি লুম্বিনীর স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ অশোক-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সমাপন হইলে, তিনি কপিলবস্তু নগরে প্রত্যানীত হন। কতিপয় বৎসর পরে পুত্রের যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া, শুদ্ধোদন উঁহার বিবাহের আয়োজন করেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে যত রূপবতী, গুণবতী বিবাহ-যোগ্যা কন্যা আছে, সিদ্ধার্থের বিবাহ-সভায় তাহাদের নিমন্ত্রণ করা হোক্।

তদনুসারে অনেকানেক মনোরমা সুরূপা কন্যকা সিদ্ধার্থের হস্তপ্রার্থী হইয়া আসে। তাহাদের একটা মেলা বসিয়া গেল। কথা হইল তাহাদের রূপ গুণ অনুসারে কুমার প্রত্যেক কুমারীকে এক একটা পুরস্কার দিবেন। সুন্দরীগণ কুমারের সমক্ষে আনীত হইলে তাঁহারা ক্ষণকালের তরে দাঁড়াইয়া একে একে চলিয়া গেলেন, কুমারও প্রত্যেকের হাতে হাতে তাঁহার যোগ্যতানুসারে এক একটি পুরস্কার দিলেন, কিন্তু কাহারও মুখপানে সতৃষ্ণভাবে চাহিয়া দেখিলেন না। সব শেষে সুপ্রবুদ্ধের কোল-কন্যা যশোধরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া কুমারের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জন্য কি কোন পুরস্কার নাই"? কুমার একটু হাসিয়া আপন কণ্ঠ হইতে একটি মুক্তার মালা খুলিয়া যশোধরার গলায় পরাইয়া দিলেন। অমনি সভাস্থ সকলে জয়জয়কার করিয়া উঠিল। প্রাচীন প্রথা অনুসারে বরকে অশ্ব চালনা ও অপরাপর ব্যায়াম ক্রীড়ায় পরীক্ষা দিতে হইল; সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যশোধরাকে পত্নীরূপে বরণ করেন, পরে কন্যাকর্ত্তার সম্মতিক্রমে রাজা মহা সমারোহে এই উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন

করিলেন। এই বিবাহের ফলে সিদ্ধার্থের রাহুল নামে একটি পুত্র জন্মে।

সিদ্ধার্থ দয়ার অবতার হইয়া জন্মিয়াছিলেন। আহারের জন্যই হউক আর আমোদের জন্যই হউক, পশুমারণ কর্ম্মে তাঁহার ঘোরতর বিতৃষ্ণা ছিল। দেবদত্ত প্রভৃতি তাঁহার বাল্য সহচরগণ মৃগয়ার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল, কিন্তু জীবহত্যা নিতান্ত নৃশংসের কার্য্য বলিয়া তিনি তাহাতে কিছুতেই যোগ দিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প আছে যে, একদা সিদ্ধার্থ তাঁহার আত্মীয় দেবদত্তের সহিত গ্রামান্তরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। দেবদত্ত ধনুর্ব্বাণ-হস্তে শিকারের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন; তিনি একটি উড়ন্ত হংসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক বাণ ছুঁড়িলেন আর পাখীটি বাণবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। অমনি সিদ্ধার্থ দৌড়িয়া গিয়া পাখীটাকে ধরিয়া সেই বাণ আস্তে আস্তে টানিয়া বাহির করিলেন, নানা গাছ গাছালী ঔষধ প্রয়োগে রক্তস্রাব বন্ধ হইল। দেবদত্ত বলিলেন "আমি পাখী মারিয়াছি, ওটা আমারই প্রাপ্য"—সিদ্ধার্থ তাহাতে সম্মত নহেন। এই পাখী লইয়া দুজনার কাড়াকাড়ি হইতে লাগিল, শেষে ধার্য্য হইল এই বিবাদ ভঞ্জনের জন্য এক বিচার-সভা ডাকা হোক্। বিচারকর্ত্তারা কেহ সিদ্ধার্থের পক্ষে কেহ দেবদত্তের পক্ষে মত দিলেন, পরিশেষে প্রধান বিচারপতি বলিলেন যে, "পাখীটিকে যিনি প্রাণদান করিয়াছেন উহা তাঁহারই প্রাপ্য, যিনি বধ করিতে উদ্যত তিনি কখনই তাহা পাইবার যোগ্য নন, অতএব উহা সিদ্ধার্থকে দেওয়া

বিধেয়”। সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিচারে তাহাই নিষ্পত্তি হইল। সিদ্ধার্থ অনেক ঔষধপত্র দিয়া, অনেক যত্নে পাখীটীর প্রাণ রক্ষা করিলেন, তাহার ক্ষতস্থান প্রকৃতিস্থ হইল, পরে সে গাহিতে গাহিতে মুক্ত আকাশে উড়িয়া গেল।

বাল্যকাল হইতেই সিদ্ধার্থের বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার মনে সেই বৈরাগ্যের ভাব বলবত্তর হইয়া উঠে। শুদ্ধোদন পুত্রের এইরূপ মনোভাব জানিতে পারিয়া তার প্রতিবিধান কল্পে অনেক চেষ্টা করিলেন। তাঁহার জন্য বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন—নৃত্য গীত বাদ্য প্রমোদ হিল্লোলে তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। যুবরাজ কিছুতেই পোষ মানেন না। এই সময় এমন কতকগুলি ঘটনা সংঘটিত হইল, যাহাতে তাঁহার মনের আগুন যেন ইন্ধনযোগে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

একদিন যুবরাজ নগরের বাহিরে উদ্যানভুমি দর্শন করিবার মানস করেন। শুদ্ধোদন নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যুবরাজ উদ্যান দর্শন করিতে যাইবেন, পথ ঘাট সকল যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হয়। যে পথ দিয়া তিনি গমন করিবেন ঐ পথ ছত্র, ধ্বজ পুষ্পাদি দ্বারা বিভুষিত ও গন্ধোদক দ্বারা অভিষিক্ত করা হউক; পথের ধারে পূর্ণ কুম্ভ ও কদলী বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হউক। রাজার আদেশে উদ্যান পথ উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও সজ্জিত হইল। কিন্তু ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্র—কে তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে? নগরোছানে ভ্রমণকালে

কতকগুলি অপ্রীতিকর দৃশ্য তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইয়া তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

প্রথম দিন একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তাঁহার ভ্রমণ-পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সারথীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই ব্যক্তি জরাদ্বারা অভিভূত হইয়া, জীর্ণ শীর্ণ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কোন কর্ম্মকাজ করিবার শক্তি নাই, বনমধ্যে যেমন জীর্ণ কাষ্ঠ পড়িয়া থাকে, ইহার দশাও সেইরূপ।

অপর একদিন দক্ষিণ দ্বার দিয়া তিনি উদ্যানভূমিতে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় একটি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সারথী বলিলেন, "এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করিতেছে। ইহার মৃত্যু আসন্ন এবং আরোগ্য লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।"

আর একদিন দেখিলেন তাঁহার সম্মুখ দিয়া এক শব-যাত্রীর দল চলিয়াছে। মৃতদেহ একটি পালঙ্কোপরি স্থাপিত এবং তাহার চারিদিকে শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনবর্গের বিলাপ-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সারথী বলিলেন, "দেব, এই লোকটির মৃত্যু হইয়াছে। এ ব্যক্তি গৃহ, পিতা, মাতা আত্মীয়স্বজনবর্গ—ইহাদের সকলকে চিরকালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছে। আহা, তাহার আপন প্রিয়জনদের কাহাকেও আর সে দেখিতে পাইবে না।"

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যাধি, জরা, মৃত্যু কি ইহাদের কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম? সারথী উত্তর করিলেন, "যুবরাজ,

তাহা নহে, মনুষ্যমাত্রেই এই সকলের অধীন। আপনি, আমি, আপনার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র সকলেই এই পথ অনুসরণ করিবে। ব্যাধি, জরা, মৃত্যু কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।"

সিদ্ধার্থ বলিলেন, "যৌবনে ধিক্, যাহার পশ্চাৎ জরা ধাবমান হয়। আরোগ্যে ধিক্, যাহা বিবিধ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত, যাহা স্বপ্নক্রীড়ার ন্যায় অলীক। জীবনে ধিক্, যাহা এইরূপ নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর। এই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু অতিক্রম করিবার যদি কোন উপায় থাকে, তাহা যেমন করিয়াই হউক আবিষ্কার করিতে হইবে।"

অন্য একদিন সিদ্ধার্থ উত্তর দ্বার দিয়া উদ্যানভূমিতে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময় একটি শান্ত দান্ত সংযত ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সিদ্ধার্থ সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যিনি এই কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে শান্তভাবে বিচরণ করিতেছেন, এই লোকটি কে?" সারথী বলিল, "ইনি একজন ভিক্ষুক, বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া সাধু জীবিকা অবলম্বন করিয়াছেন। সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক ইনি আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন, এবং দীনহীন ভাবে সামান্য আহার সংগ্রহ করিতেছেন।"

সিদ্ধার্থ বলিলেন, "এই আমার মনের মানুষ! ইনি যে পথে চলিতেছেন সেই মার্গ যিনি অনুসরণ করেন, তিনিই ধন্য।" এই লোকটিকে দেখিবামাত্র সিদ্ধার্থ তাঁহার আসন্ন জীবন চিত্র যেন মানসপটে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি পথে বাহির হইতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। কথিত আছে যে যুবরাজ চতুর্থবার উদ্যান ভ্রমণে সন্ন্যাসী দর্শনানন্তর প্রাসাদে ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দূতমুখে সংবাদ আসিল যে, তাঁহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইল—তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হায়, এ কি এক নূতন বাঁধনে আমি বাঁধা পড়িলাম, এই কঠিন বন্ধন ছেদন করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি প্রজাবর্গের আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়া বিষণ্ণ বদনে বাড়ী ফিরিলেন।

এদিকে যেমন সিদ্ধার্থ সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া গৃহত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, ওদিকে তেমনি তাঁহার পিতা যে-কোন উপায়ে হউক তাঁহাকে আটেঘাটে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। এই তাঁহার শেষ চেষ্টা। তিনি স্বীয় রাজ্যের চতুঃসীমার মধ্যে ভাল ভাল নর্ত্তকী গায়িকা, যত সব চতুরা রমণী পুরুষের মন ভুলাইতে সুপটু, তাহাদের সকলকে ডাকাইয়া যুবরাজের প্রাসাদে একত্রিত করিলেন এবং তাহাদিগকে আপন মনোগত অভিপ্রায় খুলিয়া বলিলেন। ইহারাও রাজাজ্ঞানুসারে আপন আপন সম্মোহন বাণ যুবরাজের প্রতি প্রয়োগ করিতে বিরত হইল না; কিন্তু সিদ্ধার্থ এই সকল অস্ত্রে অক্ষত রহিলেন। এই সমস্ত যাদুকরী ব্যবসায়িনীরা কিছুতেই তাঁহাকে বশ মানাইতে পারিল না। তাহাদের এইরূপ বিলাসিতার কুহকজাল বিস্তৃত দেখিয়া, যুবরাজ ক্রমে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, এবং ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার

একটুকু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা ছুটিয়া গেলে দেখেন সেই সকল যুবতীগণ যে-যেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। আলুথালু কেশ, অপরিচ্ছন্ন বেশ,—কোথায় সেই অঙ্গসৌষ্ঠব, কোথায় সেই হাব-ভাব লাবণ্য! তাঁহার চক্ষে এই দৃশ্য এমন কুৎসিৎ কদাকার বোধ হইল যে, তিনি যত শীঘ্র পারেন এই অলীক আমোদ প্রমোদের মায়াজাল কাটিয়া দূরে পলাইবার পন্থা ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন যে, বিদায়ের কালে তাঁহার শিশুটিকে শেষ দেখা দেখিয়া লইবেন ও কোলে করিয়া মুখচুম্বন করিবেন, কিন্তু শয়ন-গৃহের দরজা খুলিয়া দেখেন যে, শিশুটি ফুলশয্যায় তাহার মায়ের কোলে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। শিশুকে লইতে গেলে তাহার মাও জাগিয়া উঠিবেন, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, তাঁহার যাওয়াই বন্ধ হইয়া যাইবে; তাই তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপে চুপে সরিয়া গেলেন।

পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে তাঁহার শ্বেতাশ্ব কণ্টক সজ্জিত ছিল। তিনি তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া সারথী ছন্দকসহ সিংহদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। দ্বারপালেরা কেহই তাঁহাকে রোধ করিল না। এই তাঁহার মহাভিনিষ্ক্রমণ। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৯ বৎসর।

জাতকে লিখিত আছে যে, সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসে পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করেন। সেই রাত্রে তাঁহার রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক যোজন দূরে অনোমা নামক নদীর তীরে আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে অশ্ব হইতে নামিয়া রাজমুকুট দূরে ফেলিয়া দিলেন, ও অঙ্গ

হইতে মণিমুক্তা আভরণ সকল খুলিয়া ছন্দকের হস্তে দিয়া কহিলেন, "ছন্দক, এই সমস্ত আভরণ নাও, আর কণ্টককে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও; আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম"। ছন্দক বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল, "প্রভু! আমাকে ফিরাবেন না, আমিও গৃহত্যাগী হইয়া আপনার অনুগামী হইব"। কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে ফিরিয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেন, বলিলেন "তোমার এখনো সন্ন্যাস গ্রহণের সময় হয় নাই, তুমি না ফিরিলে আমি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছি মনে করিয়া আমার পিতা ও বাড়ীর আর সকলে কি ভাবিবে? তুমি যাও, এবং রাজবাটীর সকলকে বল আমার সমস্তই মঙ্গল। আমি বহুকাল ধরিয়া যে প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পালন করিতে চলিলাম, আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইলেই আমি বাড়ী ফিরিব, আমার জন্য কেহ যেন চিন্তাকুল না হন।"

কুমারের আদেশক্রমে ছন্দক অগত্যা অশ্ব ও আভরণ লইয়া শোকার্ত্তহৃদয়ে রাজভবনে ফিরিয়া গেল, এবং রাজাকে সংবাদ দিল যে, যুবরাজ গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসীবেশে কোথায় চলিয়া গেলেন তাহার কোন ঠিকানা নাই।

গৌতম ছন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে বিশ্রাম করতঃ পরিশেষে মগধ-রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। বিম্বিসার তখন ঐ প্রদেশের প্রবল-প্রতাপ নরপতি ছিলেন। সিদ্ধার্থ নগরে ভিক্ষা করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার শরীরে অলোকসামান্য

তেজঃপুঞ্জদৃষ্টে নাগরিকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। এই নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা রাজসভা পর্য্যন্ত পৌঁছে। বিম্বিসার একদিন প্রাতঃকালে বহু পরিজন সমভিব্যাহারে বহুমূল্য ভেট লইয়া সিদ্ধার্থের সমীপে উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার সুবিমল দেহকান্তি দর্শনে বিমোহিত হইলেন। পরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রভু! আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমার সহকারী হউন। যদি আপনি আমার অনুবর্ত্তী হন, আপনি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইবেন। আপনি যাহা চান সকলি পাইবেন।" তৎপরে তাঁহাকে বহুবিধ মূল্যবান সামগ্রী উপঢৌকন দিয়া কহিলেন "আমার সঙ্গে আসুন, এই দুর্ল্লভ কাম্যবস্তুসকল উপভোগ করিয়া সুখী হইবেন।" এই সাধুকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আপনার পার্শ্বচর করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে রাজা এইরূপ অশেষ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ মধুর প্রিয় বাক্যে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আপনার সর্ব্বথা মঙ্গল হউক, এই সকল ভোগ্য বিষয় আপনারি থাকুক, আমি কোন কাম্যবস্তুর প্রার্থী নহি। বিষয়-বাসনা আমার চিত্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। আমার লক্ষ্যস্থান স্বতন্ত্র।" পরে তিনি রাজার নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন "কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধত্ব লাভের আশয়ে আমি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি।" বিম্বিসার তখন বলিলেন "স্বামিন্, আমি তবে বিদায় হই। আপনি যদি ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, আমি আপনার ধর্ম্মের

আশ্রয় লইব।” এই বলিয়া বিম্বিসার তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া রাজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজার সহিত সিদ্ধার্থের এই প্রথম পরিচয়। এক্ষণে তিনি বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধত্ব লাভের পর তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির নানা উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

রাজগৃহ ভাগীরথীর রমণীয় অধিত্যকায় অবস্থাপিত এক অপূর্ব্ব সাধুক্ষেত্র। বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থ পঞ্চ শৈলখণ্ডে পরিবেষ্টিত, বাহিরের উপপ্লব হইতে সুরক্ষিত, প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্যে পরিবৃত, বিজনতাসুলভ অথচ নগরীর সন্নিকর্ষবশতঃ ভিক্ষান্ন সংগ্রহের অনুকূল ইত্যাদি কারণে, ঐ সকল গিরিগুহায় বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী বাস করিত। তাহাদের মধ্যে আলাড় কলম ও রুদ্রক নামক দুইজন খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ উপাধ্যায়ের সঙ্গে গৌতমের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রথমে তিনি আলাড় কলমের নিকট গমন করেন। আলাড়ের তিনশত শিষ্য ছিল। গৌতম তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকটে দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু সে শিক্ষায় তিনি তৃপ্তি-লাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি রুদ্রকের নিকট কিছু কাল ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। তাহাও তাঁহার মনঃপূত হইল না। এই দুই গুরূপদিষ্ট জ্ঞানমার্গে তাঁহার অভীপ্সিত গম্যস্থানে পৌঁছিতে না পারিয়া, তিনি সিদ্ধিলাভের অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে এই একটি সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, তপশ্চর্য্যার দ্বারা দেবতাদেরও সমকক্ষ হওয়া সম্ভব

হয়, এবং দৈবশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি লাভ ও প্রভুত পুণ্যসঞ্চয় করা যায়। আলাড় ও রুদ্রকের নিকটে দর্শন শিক্ষা করিয়াও গৌতম যখন সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, একান্তে অবস্থানপূর্ব্বক সেই লোকবিশ্রুত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহার চূড়ান্ত সীমা পর্য্যন্ত গিয়া দেখিবেন তিনি কি ফল লাভ করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সন্নিকট উরুবেলা বনে গমন করিয়া, নৈরঞ্জনা নদীতীরে পাঁচজন অনুরক্ত শিষ্যের সাহচর্য্যে ছয় বৎসর যাবৎ ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। "শূন্যে আলম্বিত বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায়" তাঁহার এই তপস্যার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। এই কঠোর তপশ্চরণে তাঁহার মুখবিবর ও নাসিকারন্ধ্র হইতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল। ক্রমে তাঁহার কর্ণছিদ্র রুদ্ধ হইল। তিনি তাঁহার আহার সংযত করিয়া আনিলেন, এমন কি শেষে একটিমাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, এবং এইরূপ উপবাস ও শরীর শোষণে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেলেন। অবশেষে একদিন চিন্তামগ্ন চিত্তে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিল যে তাঁহার যথার্থই মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। এই অবস্থায় একটি রাখাল বালক তাঁহাকে এক বাটী দুগ্ধ আনিয়া দিল, সেই দুগ্ধ পান করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই প্রকার তপশ্চর্য্যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে হতাশ হইয়া পূর্ব্ববৎ

নিয়মিত আহারাদি করিতে লাগিলেন, এবং তপস্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। এই সঙ্কট সময়ে, "যখন তাঁহার পক্ষে অপরের সমবেদনা বিশেষ আবশ্যক ছিল, যখন অনুরক্ত জনের প্রীতি ভক্তি ও উৎসাহবাক্য তাঁহার সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে বল দিতে পারিত, তখন তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী চলিয়া গেল। তপশ্চরণ পরিত্যাগ করার দরুণ তিনি তাহাদের শ্রদ্ধা হারাইলেন, এবং এই দারুণ দুঃসময়ে তিনি তাহাদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিফলতার তীব্র জ্বালা একাকী সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন।"

এই অসহায় অবস্থায় তিনি নৈরঞ্জনাতীরে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে নিকটস্থ এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে গিয়া ধ্যানমগ্ন হন। ইহার অব্যবহিতপূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসিনী সুজাতা নাম্নী একটি সাধ্বী রমণী এই বনে আগমন করেন। সুজাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"আমার একটি শিশু সন্তান হইলে বনদেবতার নিকট পূজা দিব"। যখন তিনি এই ঘোরতর উপোষণাদি কৃচ্ছ্রসাধনে ম্রিয়মাণ তপস্বীকে দেখিলেন, তিনি তাঁহাকে বনদেবতা ভাবিয়া তাঁহার সম্মুখে ভেট লইয়া আসিলেন। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, কি আনিয়াছ ?" সুজাতা কহিল—"আমি আপনার জন্য এই পরম উপাদেয় পরমান্ন আনিয়াছি। ভগবন্! সদ্যঃপ্রসূত শত গাভীদুগ্ধে আমি পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করিয়াছি, তাহাদের দুগ্ধে পঁচিশ, তাহাদের দুগ্ধে আবার বারোটি গাভী পরিপুষ্ট। এই দ্বাদশ গাভীর দুগ্ধ পান করাইয়া আমার পালের মধ্যে ছয়টি ভাল ভাল

গরু বাছিয়া তাহাদের দুধ দুহিয়া লই। সেই দুগ্ধ উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে সুগন্ধী মশলা দিয়া পাক করিয়া আনিয়াছি। আমার ব্রত এই যে, দেবতার অনুগ্রহে আমার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিলে, এই অন্ন উৎসর্গ করিয়া দেবার্চ্চনা করিব। প্রভু! এখন সেই পরমান্ন লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন"।* সিদ্ধার্থ সুজাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করিয়া সুখী হইয়াছ, সেইরূপ আমিও যেন আমার জীবনব্রত সাধন করিতে সক্ষম হই।" এই দুগ্ধপানে তিনি শরীরে বল পাইয়া পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে গিয়া যোগাসনে আসীন হইলেন। সেই রাত্রে ঐ বৃক্ষতলে সমাধিস্থ হইয়া তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন। সেই অবধি ঐ বৃক্ষ বোধিবৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

বোধিসত্ত্ব যখন নৈরঞ্জনাতীরে বোধিদ্রুমমূলে যোগাসনে আসীন হন, তখন তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং।
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু॥
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং।
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

এ আসনে দেহ মম যাক্ শুকাইয়া,
চর্ম্ম অস্থি মাংস যাক্ প্রলয়ে ডুবিয়া।

*Light of Asia—Edwin Arnold.

না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্ল্লভ জগতে,
টলিবে না দেহ মোর এ আসন হতে।

এই আসনে বসিয়া বোধিসত্ত্বের দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলেন। তিনি বৃক্ষতলে ধ্যানযোগে জগতের যে কার্য্যকারণশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা এই :—

অবিদ্যা হইতে সংস্কার।
সংস্কার হইতে বিজ্ঞান (Consciousness)।
বিজ্ঞান হইতে নামরূপ।
নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (অর্থাৎ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়)।
ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ।
স্পর্শ হইতে বেদনা।
বেদনা হইতে তৃষ্ণা।
তৃষ্ণা হইতে উপাদান (আসক্তি)।
উপাদান হইতে ভব।
ভব হইতে জন্ম।
জন্ম হইতে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ ও যন্ত্রণা।

অবিদ্যাই সকল দুঃখের মূল। অবিদ্যা নাশে সংস্কার বিনষ্ট হয়; পরে নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, তৃষ্ণা, আসক্তি প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে বিনষ্ট হইলে, জন্মবন্ধন ছিন্ন হয়; পরিশেষে জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, সর্ব্ব দুঃখ বিদূরিত হয়। এইরূপে দুঃখের মূলকারণ ও মূলচ্ছেদ বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে সুস্পষ্ট উপলব্ধি

করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আমাদের সকল দুঃখের কারণ, এবং অবিদ্যার অপগমেই দুঃখের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

বোধিসত্ত্ব যে মুহূর্ত্তে জগতের দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের এইরূপ প্রণালী নির্দ্ধারণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি "বুদ্ধ" এই নাম ধারণ করেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াই তিনি নিম্নোদ্ধৃত উদান গান করিয়াছিলেন:—

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সম্ অনিব্বিসম্
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখাজাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখার গতং চিত্তং তণ্‌হানং খয় মজ্‌ঝগা।

জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তি চয়,
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর কয়েক সপ্তাহ বুদ্ধদেব ঐ অঞ্চলেই অবস্থান করিলেন। সপ্তম সপ্তাহে ত্রিপুষ ও ভল্লিক নামক

দুইজন বণিক পাঁচশত শকট ও বিবিধ পণ্যসহ উৎকল হইতে ঐ পথে আসিতেছিলেন; দেখেন যে কাষায় বস্ত্রপরিহিত, অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান একটি তাপস-কুমার এক বৃক্ষতলে আসীন। ভোজন-বেলা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, উহারা মধুপিষ্টক প্রভৃতি নানা সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্য একটি পিণ্ডপাত্রে সাজাইয়া কুমারকে নিবেদন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পিণ্ডপাত্র গ্রহণ করুন।" বুদ্ধদেব উহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ঐ পিণ্ডপাত্র গ্রহণ করিয়া উহাদের নিকট সদ্ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলেন। উহারা ভগবৎ-কথিত উপদেশ শ্রবণ করিয়া বুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই দুই বণিক বুদ্ধদেবের প্রথম শিষ্যরূপে পরিগণিত।

বুদ্ধত্ব পাইবার পূর্ব্বে গৌতম বোধিবৃক্ষতলে যখন যোগাসনে আসীন ছিলেন, তখন "মার" অর্থাৎ পাপাত্মা সয়তান বা কামদেব স্বীয় পুত্র-কন্যা দলবল লইয়া, কত ভয়, কতপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিবার চেস্টা করিতেছিল,—যীশুখৃষ্টের প্রতি সয়তানের আক্রমণ যেরূপ বর্ণিত আছে, এও কতকটা সেইরূপ,—কিন্তু কিছুতেই তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বুদ্ধদেব যোগাসনে অটল রহিলেন, অপ্সরাগণের সহস্র মায়া পরাহত হইল। এই সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, যখন তিনি সম্বুদ্ধ হইলেন, তখন তিনি স্বোদ্ভাবিত ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া, একাকী সন্দিগ্ধ মনে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহা লোকের মধ্যে প্রচার করিবেন কি না, এই

তর্ক তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, এই সব বিষয়াসক্ত চঞ্চল-চিত্ত লোকেরা তাঁহার কথা কি বুঝিবে? অবশেষে ব্রহ্মাসহাম্পতি* স্বর্গ হইতে নামিয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন, এবং উৎসাহবাক্যে তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারে উৎসাহিত করিলেন;—বলিলেন যে তিনি কর্ণধার হইয়া রক্ষা না করিলে লোকেরা সংসারের মোহার্ণবে মগ্ন হইয়া অধঃপাতে যাইবে। ব্রহ্মার প্ররোচনায় বুদ্ধদেব সত্যধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইলেন। কিন্তু কাহার নিকট কোথায় যাইবেন? প্রথমে আলাড় কলম ও রুদ্রক—তাঁহার ভূতপূর্ব্ব দুই গুরুর নাম—তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহাদের নিকট তিনি অনেক শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রখর বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, ভাবিলেন তাঁহারা তাঁহার উপদেশ গ্রহণের যোগ্য পাত্র বটে; কিন্তু সন্ধান করিয়া দেখিলেন তাঁহাদের উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাঁহার পূর্ব্বতম পঞ্চ শিষ্যের কথা স্মরণ করিলেন, ও জানিতে পারিলেন তাঁহারা বারাণসীর মৃগদাব নামক স্থানে ঋষিপত্তনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার মানসে তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অষ্টম সপ্তাহে বারাণসী যাত্রা করেন। গিয়া এই পঞ্চ ভিক্ষুর বাসস্থানে উপনীত হইলেন। প্রথমে শিষ্যেরা স্থির করিয়াছিল যে তাঁহাকে বসিবার আসন দিবে না, তাঁহার কোনরূপ আতিথ্যসৎকার করিবে না;

---

*এই দেবতা বুদ্ধের একজন হিতৈষী সহচর বলিয়া বর্ণিত।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন বুদ্ধদেব তাহাদের সমীপে আগমন করিলেন, তখন তাঁহার তেজঃপুঞ্জ রূপ-রাশি সন্দর্শন করিয়া তাহারা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেল, ও আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিল; তথাপি পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া কেহ তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকে, কেহ তাঁহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করে, ইহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, আমাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিও না, তথাগত এখন সম্বুদ্ধ হইয়াছেন, দিব্য জ্ঞানলাভে আপ্তকাম হইয়াছেন। আমার উপদেশ গ্রহণ কর।" এই কথা শুনিয়া সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধের পদে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "ভগবন্! দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করুন।" কথিত আছে যে, এমন সময় অকস্মাৎ সপ্তরত্নময় শত আসন সেই স্থানে কে যেন বিছাইয়া দিল, বুদ্ধদেব একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। উপোরোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোভাগে আসীন হইল। সেই সময় তাঁহার শরীর হইতে স্বর্গীয় জ্যোতি নির্গত হইয়া দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল, স্বর্গ হইতে দেবতারা দলে দলে নামিয়া আসিলেন; স্বর্গধাম শূন্য হইয়া গেল। এই শুভ মুহূর্ত্তে সুমন্দ গন্ধবহ ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল, সুরভি পুষ্পসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। সহসা দিগদিগন্ত ধ্বনিত করিয়া ভৈরব রবে ভেরী বাজিয়া উঠিল, আর জনকোলাহল সব থামিয়া গেল। তখন বুদ্ধদেব কথারম্ভ করিলেন। তিনি পালী ভাষায় কথা

কহিতেছিলেন, কিন্তু উপস্থিত অসংখ্য লোকের মধ্যে প্রতিজনে ভাবিল যে, তিনি তাহারই মাতৃভাষায় তাহাকে উপদেশ দিতেছেন। সেই উপদেশের প্রতি কথা তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরে অনুবিদ্ধ হইল। তাহারা তাঁহার সেই কথামৃত পানে জ্ঞানতৃপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

সে উপদেশের সার মর্ম্ম এই ঃ—

মনুষ্যেরা মোহবশতঃ বিপথে পদার্পণ করে; একদিকে বিষয়-লালসা ভোগাসক্তি, অন্য দিকে অনর্থক কঠোর তপস্যায় শরীর-শোষণ। আমি মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়াছি, সেই আষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিলে দেখিতে পাইবে যে দুঃখক্লেশের মূলচ্ছেদ হইবে—শান্তি ও নির্ব্বাণমুক্তি তোমাদের আয়ত্ত হইবে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাই "ধর্ম্মচক্র"। তাহাতে চারিটি গভীর তত্ত্ব সন্নিবেশিত আছে, সেগুলি এই ঃ—

প্রথম।—সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। জন্মে দুঃখ, রোগে দুঃখ, জরামরণ দুঃখময়। যাহা ভাল লাগে না তাহার সঙ্গে মিলনে দুঃখ, ভালবাসার পাত্রের বিয়োগ দুঃখময়।

দ্বিতীয়।—বিষয়তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ।

তৃতীয়।—এই বিষয়তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন করাতেই দুঃখনিবৃত্তি।

চতুর্থ।—দুঃখনিবৃত্তির আষ্টাঙ্গিক পথ আছে, সেই পথ আশ্রয় করিয়া চলিলেই তোমরা বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

সে পথ এই অষ্টপ্রকার :—

১। সম্যক্ দৃষ্টি

২। সম্যক্ সঙ্কল্প (সঙ্কল্প ঠিক রাখা)

৩। সম্যক্ বাক্য (সত্য সরল প্রিয় বাক্য বলা)

৪। সম্যক্ কর্ম্মান্ত (সদাচরণ)

৫। সম্যক্ আজীব (সর্ব্বভূতে অহিংসাপূর্ণ সাধু জীবিকা অবলম্বন)

৬। সম্যক্ ব্যায়াম (আত্মসংযম প্রভৃতি উপায়ে আত্মোৎকর্ষ সাধন)

৭। সম্যক্ স্মৃতি (ধারণা ঠিক রাখা)

৮। সম্যক্ সমাধি (জীবনের সুগভীর তত্ত্বসকলের ধ্যান ধারণা ও নিদিধ্যাসন)

এই আষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গ অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে পথে কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি যে কয়েকটি সংযোজন অর্থাৎ বন্ধন আছে, তাহা ছেদন করিতে হইবে ; এই নির্দ্দিষ্ট পুণ্যপথে চলিলে দুঃখ, শোক অতিক্রম করিয়া তোমরা নির্ব্বাণরূপ পরম পুরুষার্থ লাভে সমর্থ হইবে।* তথাগত এইরূপে বারাণসীতে সর্ব্বপ্রথমে "ধর্ম্মচক্র" প্রবর্ত্তন করিলেন। বুদ্ধদেবের এই হৃদয়স্পর্শী জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহার উপদিষ্ট নবীন পন্থার অনুবর্ত্তী হইল ; তাঁহাদের পূর্ব্বতন গুরুশিষ্য সম্বন্ধ আবার নবীকৃত

---

*এই দুঃখতত্ত্ব বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রতীত্য-সমুৎপাদ বলিয়া অভিহিত।

হইল। সর্ব্ব প্রথমে বয়োবৃদ্ধ কৌণ্ডিণ্য, যাঁহার জীবনের ত্রিকাল অতীত হইয়াছে, তিনি "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। অবশিষ্ট চারজন প্রথমে ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের মনে যাহা কিছু সংশয় ছিল, আরো তর্কবিতর্কের পর তাহা বিদূরিত হইল; তাহারাও একে একে বুদ্ধদেবের শিষ্যরূপে দীক্ষিত হইল। বুদ্ধের এই প্রথম পঞ্চ শিষ্য* ভবিষ্যতে বৌদ্ধ সমাজে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া, কালক্রমে অর্হৎমণ্ডলীর মধ্যে স্থান লাভ করিলেন।

বারাণসীতে অবস্থিতি কালে প্রথমে উল্লিখিত পঞ্চভিক্ষু তাঁহার উপদেশক্রমে দীক্ষিত হন। ক্রমে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; বর্ষানন্তর ৬০ জন শিষ্য হইল, তখন তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে একত্র করিয়া এই উপদেশ দিলেন—"হে ভিক্ষু-গণ, তোমরা আমার উপদেশ লাভে এইক্ষণে পঞ্চরিপু দমন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছ। এখন তোমাদের কর্ত্তব্য যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়া উচ্চ নীচ সকল লোকের মধ্যে আমার উপদিষ্ট সত্য ঘোষণা কর। আমি এক্ষণকার মত উরুবেলার বনে গিয়া আমার ব্রত উদ্‌যাপন করি।" উরুবেলায় কিয়ৎ-কাল বাস করিয়া তিনি কতিপয় নূতন শিষ্য সংগ্রহ করিলেন, এবং সেখান হইতে রাজা বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে সশিষ্য

---

*পঞ্চশিষ্যের নাম কৌণ্ডিণ্য, ভদ্রজিৎ, বাষ্প (বপ্পা), মহানাম এবং অশ্বজিৎ।

যাত্রা করিলেন। রাজা বহু সম্মানপূর্ব্বক বুদ্ধদেবের দর্শন ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া, পরদিন তাঁহাকে ভিক্ষুমণ্ডলী সহ রাজ-বাটীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধদেব যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন, এবং আহারাদি সমাপ্ত হইলে, রাজা বিম্বিসার বেণুবন (বাঁশবন) নামক এক সুরম্য উদ্যান গুরুদক্ষিণাস্বরূপ বৌদ্ধসমাজকে দান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। বুদ্ধ-দেব এখানে অনেক বৎসর বর্ষাকাল যাপন করেন, এবং তাঁহার অনেক উপদেশ এখান হইতেই প্রদত্ত হয় বলিয়া এই স্থান বৌদ্ধদের মহাতীর্থরূপে প্রসিদ্ধ।

ইত্যবসরে এক সময়ে তিনি কপিলবস্তু গিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে রাজ্য হইতে প্রজাবৎসল যুবরাজ যখন বৈরাগ্য-দীপ্ত হৃদয়ে বাহির হইয়াছিলেন, সে এক কাল,—আর এক্ষণে সন্ন্যাসীবেশে, মুণ্ডিত কেশে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে সেই রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া গৌতম দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন শুনিয়া রাজা শুদ্ধোদন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, তিনি যেখানে ছিলেন সত্বর আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং কাতর স্বরে কহিলেন, "এই কি আমাদের শাক্যকুলপ্রদীপ যুবরাজ সিদ্ধার্থ? তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছ, এ কি কখন সহ্য হয়? হা বৎস! এরূপ কেন হইল?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমার কুলধর্ম্ম এই।" মহারাজ কহিলেন, "সে কি কথা? কোন্ বংশে তোমার জন্ম? ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজপুরুষেরা কি তোমার পিতৃপুরুষ ছিলেন না? তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভিক্ষাবৃত্তি

অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ কখনও কি শুনিয়াছে?" গৌতম কহিলেন "আমার বংশ রাজবংশ নয়, বুদ্ধেরা আমার পূর্ব্ব পুরুষ। তাঁহাদেরই চিরন্তন প্রথানুসারে আমি ভিখারী বেশে এই রাজদ্বারে সমাগত হইয়াছি। কিন্তু মহারাজ, আত্মপ্রভাবে এবং প্রেমবলে, এই যে মলিনবসন দীনহীন ভিখারী, মহা প্রতাপশালী রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও আজ তার উচ্চাসন। আমি যে অক্ষয় অমূল্য রত্ন ভেট লইয়া আসিয়াছি, তাহা পিতৃদেবের চরণে সমর্পণ করি আমার একান্ত ইচ্ছা, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন।" শুদ্ধোদন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পুত্রের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় রাজা প্রজা মন্ত্রীবর্গ সভাস্থ সকলকে তিনি তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। চতুরার্য্যসত্য, অষ্টার্য্যমার্গ, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, অহিংসা, অনুকম্পা, মৈত্রী, শাশ্বত শান্তিরূপিণী নির্ব্বাণ মুক্তি—এই সকল সত্য অমৃতধারার ন্যায় বর্ষিত হইল। সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন প্রীত হইলেন; তাঁহার সকল সংশয় দূর হইল, সকল ক্ষোভ মিটিয়া গেল।

যখন রাজপুত্র প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজপরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলেই উপস্থিত হইল, কেবল যশোধরা নাই। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "যশোধরা কোথায়?" তিনি আসিবেন না শুনিয়া গৌতম রাজার সহিত স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখেন, যশোধরা মলিনবেশে রুক্ষ আলুলায়িতকেশে ঘরে বসিয়া আছেন। স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার চিরসম্বরিত প্রেমাশ্রু উথলিয়া

উঠিল,—তিনি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে রাজাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অভাগিনী যশোধরা এতকাল পতিবিরহে দীনবেশে, অনাহারে, অনিদ্রায়, কষ্টে দিনযাপন করিতেছিলেন, রাজা সে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। বুদ্ধের মন গলিয়া গেল। তখন তিনি যশোধরা পূর্ব্বজন্মে কিরূপ গুণবতী ছিলেন, তাহার এক 'জাতক' গল্প বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। পরে তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণে যশোধরার হৃদয়মন আকৃষ্ট হইল, এবং বৌদ্ধদের মধ্যে সন্ন্যাসিনীশ্রেণী স্থাপিত হইবার পর তিনি বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীর মধ্যে প্রধানা বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

কপিলবস্তু জনপদের মধ্যে অনেকে বুদ্ধ-উপদেশ গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা সঙ্ঘভুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে চারিজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। আনন্দ।

২। অনিরুদ্ধ।

৩। দেবদত্ত।

৪। উপালী।

প্রথম তিনজন তাঁহার আত্মীয়। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দের নাম করিতে হয়, যিনি বুদ্ধের মরণ কাল পর্য্যন্ত পার্শ্বচররূপে তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় রত থাকিয়া গুরুদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব স্বীয় ৫৫

বৎসর বয়সে তাঁহাকে উপস্থায়ক (Personal Assistant) পদে নিযুক্ত করেন।

দ্বিতীয়, রাজা শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র অনিরুদ্ধ, যিনি বৌদ্ধ-তত্ত্বদর্শী সুপণ্ডিত বলিয়া বৌদ্ধ সমাজে খ্যাতি লাভ করেন।

তৃতীয়, বুদ্ধের শ্যালক দেবদত্ত, ইনি ভিন্ন-প্রকৃতির লোক ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অবধি বুদ্ধের সহিত ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়।

দেবদত্তের ইচ্ছা এই যে, তিনি নিজে এক নূতন সম্প্রদায় পত্তন করিয়া গৌতমের পদারূঢ় হন। এই উদ্দেশে তিনি পাঁচশত শিষ্য সংগ্রহ করিয়া এক স্বতন্ত্র সঙ্ঘ স্থাপন করিবার উদ্যোগ করেন। মগধ-রাজকুমার অজাতশত্রু ইঁহাদের জন্য গয়ানদীর তীরে এক বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। জনশ্রুতি এই যে, দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু নানাপ্রকার ছল, বল, কৌশলে স্বীয় পিতার প্রাণ সংহার করেন। অনন্তর তিনি মগধের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

রাজাকে আপনার পক্ষে টানিয়া লইয়া, দেবদত্ত বুদ্ধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। তিনি যে বুদ্ধ-পদপ্রাপ্তির উচ্চাভিলাষ পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত নিস্ফল জানিয়া বুদ্ধকে সরাইবার অন্য পন্থা দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে, মগধরাজকে ফুসলাইয়া গৌতমের বিপক্ষে উত্তেজিত করিলেন, পরে তাঁহার সাহায্যে নানাবিধ গুরুমারা ফাঁদ পাতিলেন। কিন্তু যেদিকে যান কোন দিকেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না। তিনি রাজার নিকট হইতে একদল ধনুর্ধারী সেনা লইয়া

গৌতমকে মারিতে পাঠান—তাহারা গৌতমের নিকট যাইবামাত্র তাহাদের ধনুর্ব্বাণ হাত হইতে খসিয়া পড়ে। তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, ও বুদ্ধদেব তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া এই সৈন্যদলকে শিষ্যদলভুক্ত করেন। পরে দেবদত্ত স্বয়ং পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া শৈলশৃঙ্গ হইতে সুবৃহৎ শিলাখণ্ড অবসর বুঝিয়া বুদ্ধের মাথার উপর নিক্ষেপ করিলেন—আর অমনি তাহা তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। বুদ্ধকে পদদলিত করিতে যে উন্মত্ত বন্যহস্তী প্রেরিত হয়, সে তাঁহার সম্মুখে গিয়া নিরীহ শান্ত ভাব ধারণ করিল। এইরূপে দেবদত্তের গুরুবধ-চেষ্টা সর্ব্বথৈব ব্যর্থ হইল।

রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার পর অজাতশত্রু পিতৃহত্যা মহাপাপে জর্জ্জরিত হইয়া দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন—তাঁহার চিত্তে বিন্দুমাত্র শান্তি রহিল না। ইত্যবসরে একদিন পূর্ণিমা তিথিতে রাজগৃহে এক মহোৎসব হয়। তদুপলক্ষে রাজমন্ত্রীগণ বৈদ্যরাজ জীবকের পরামর্শে অজাতশত্রুকে বুদ্ধের নিকট লইয়া যান। তাঁহার উপদেশ শ্রবণে রাজার চৈতন্য জন্মে এবং তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীয় পাপসকল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার পূর্ব্বক বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

এই ঘটনার পর অবধি দেবদত্তের প্রভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসে; তখন তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘে ভেদ ঘটাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি বুদ্ধের নিকট সঙ্ঘের কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার

প্রস্তাব করেন। বুদ্ধদেব তাঁহার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায়, দেবদত্ত অসন্তুষ্ট হইয়া গয়ানদীতীরস্থ স্বীয় বিহারে ফিরিয়া যান। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চতুর্থ, রাজ-নাপিত উপালী। উপালী জাতিতে নাপিত, কিন্তু স্বীয় ধর্ম্মপ্রাণতা ও বুদ্ধিবলে তিনি বৌদ্ধমণ্ডলীর নেতৃবর্গের অগ্রগণ্য হয়েন। বৌদ্ধসঙ্ঘে যে জাত্যভিমান স্থান লাভ করে নাই, তাহার এই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কপিলবস্তুতে বুদ্ধদেবের অবস্থান কালে একদিন যশোধরা তাঁহার পুত্র রাহুলকে রাজপুত্রের মত বেশভূষায় সাজাইয়া তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। রাহুলের বয়স তখন সাত বৎসর। মাতা তাহাকে বলিলেন, "ঐ যে সাধু দেখ্‌ছিস্‌, ঐ তোর পিতা। ওঁর কাছে কত টাকাকড়ি ঐশ্বর্য্য আছে,—কাছে গিয়া তোর বাপের ধন ভিক্ষা চাস্‌।" রাহুল বলিল—"আমার পিতা? রাজাই ত আমার বাবা, আর কে?" যশোধরা বুদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন। রাহুল বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া আপন পৈতৃক সম্পত্তি ভিক্ষা করিল। বুদ্ধ কহিলেন, "বৎস! সোণা, রূপা, মণিমাণিক্য আমার কাছে নাই। আমার কাছে যে সত্যরত্ন আছে, তাহা আমি দিতে পারি, যদি আমাকে কথা দেও যে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে।" এই বলিয়া রাহুলকে তাহার ধারণানুসারে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, এবং বালক পিতৃ-উপদেশ গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধসমাজভুক্ত হইল।

এই বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ

হইলেন। সিদ্ধার্থ গেল, আনন্দ গেল, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অনিরুদ্ধ গেল, এখন তাঁর পৌত্রটীকে তাঁর পার্শ্ব হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল, তাঁর রাজ্যাধিকারী আর কেহই রহিল না। রাজা সিদ্ধার্থের প্রতি এ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করাতে সিদ্ধার্থ নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! যাহা হইয়াছে মার্জ্জনা করিবেন, ভবিষ্যতে এরূপ আর হইবে না। পিতৃব্যের অনুমতি বিনা অল্পবয়স্ক বালকের দীক্ষাবিধি নিষিদ্ধ—আমি এই নিয়ম করিয়া দিতেছি।" এইরূপ অনেক আশ্বাস দিয়া কিছুদিন পরে পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি রাজগৃহের বেণুবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

বুদ্ধদেবের মহাবোধি বৃক্ষতলে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কপিলবস্তু গমন ও তথা হইতে রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রায় আঠার মাস কাল অতিবাহিত হয়। এই স্বল্পকালব্যাপী বুদ্ধজীবনীর ইতিবৃত্ত বৌদ্ধগ্রন্থসকলে আনুপূর্ব্বিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর কাল নির্ণয় করা সুকঠিন, কেন না সেই সমস্ত গ্রন্থে সে বিষয়ে কোন মিল নাই। যে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, তাহা আর কিছুই নয়—গৌতম বুদ্ধের স্মরণীয় কোন কৃত্য অথবা স্মরণীয় কথাবার্ত্তা, উপদেশ। এই স্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে—কেবল দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই ভাগ উপসংহার করিব।

বৌদ্ধধর্ম্মে সদ্যোদীক্ষিত সুরাপরন্তের একটি বণিক তাঁহার প্রতিবাসী আত্মীয়বর্গকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে সমুৎসুক

হইয়া গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করাতে বুদ্ধ কহিলেন,—"আমি শুনিয়াছি সুবাপরন্তের লোকেরা বড় দুষ্ট, রাগী ও অত্যাচারী; তাহারা তোমার অপবাদ ও নিন্দা করিলে তুমি কি করিবে?"

—আমি চুপ করিয়া থাকিব।

—তাহারা যদি তোমাকে ধরিয়া মারে?

—আমি তাদের মারিব না।

—যদি তোমাকে বধ করিরার চেষ্টা করে?

—মৃত্যুর হাত এড়াইবার উপায় নাই, শমন ত আসিবেই, কিন্তু তাহাতে ভয় কি? অনেকে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার জন্য অনেক সময় মৃত্যু চায়, কিন্তু আমি তা করিব না। তাকে ড্যকিয়াও আনিব না, আর আসে ত বারণও করিব না।

এই উত্তরে গুরুদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচার কার্য্যে বাহির হইতে অনুমতি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আর এক সময় একটি যুবতী স্ত্রী তাহার পুত্রটি হারাইয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। তাহার নাম কিসাগোতমী। অল্পবয়সে তাহার বিবাহ হয় এবং একটি পুত্র জন্মে। শিশুটি দেখিতে অতি সুন্দর ছিল, আর চলিতে শিখিবার বয়সেই সর্পদংশনে মারা পড়ে। গোতমী মৃত শিশুটি কোলে লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, যদি কেহ কোন ঔষধ দিয়া তাহাকে বাঁচাইতে পারে। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁহাকে বলিল,—"তুমি যে ঔষধ চাহিতেছ আমার কাছে তা নাই। কিন্তু আমি জানি একজন তোমাকে ঔষধ

দিতে পারেন। ঐ গৈরিকবসনধারী বুদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে যাও, বলিয়া দিবেন।" গোতমী বুদ্ধের নিকট যাইয়া বলিলেন, "প্রভো! আমি আপনার নাম শুনিয়া বড় আশা করিয়া আপনার কাছে এসেছি, এখন একটা ঔষধ বলিয়া দিন যাতে আমার এই ছেলেটি প্রাণদান পায়।" বুদ্ধদেব কহিলেন—"আচ্ছা বলিয়া দিব, যদি আমি যে জিনিষ বলিতেছি আমায় তা আনিয়া দিতে পার; আর কিছু নয়, এক মুঠা সরিষার বীজ।" যখন গোতমী আগ্রহের সহিত তাহা আনিয়া দিতে স্বীকৃত হইল, তখন তিনি কহিলেন, "কিন্তু একটী সর্ত্ত আছে। এমন ঘর থেকে আনিতে হইবে, যেখানে বাপ, মা, স্বামী, পুত্র কিম্বা ভৃত্য, ইহার কোন একজনের মৃত্যু হয় নাই।" গোতমী তাহাই অঙ্গীকার করিয়া মৃত শিশু কোলে বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন। এক মুঠা সরিষা দিতে সকলেই প্রস্তুত, কিন্তু যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ীতে মা-বাপ-স্বামী-পুত্র কি ভৃত্য কেহ মরিয়াছে কি না?" তাহারা বলিল, "বলেন কি? জীবন্ত লোক অল্প, মৃতের সংখ্যাই অধিক।" কেহ বলে আমার একটি পুত্র মরিয়াছে, কেহ বলে আমার পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে; কেহ বলে আমার ভৃত্যটি মরিয়াছে। অবশেষে যেখানে একটি লোকও মরে নাই, এমন গৃহ না পাইয়া রমণী বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, সরিষার বীজ এনেছ কি?" গোতমী বলিলেন, "প্রভো, আনি নাই। যাদের জিজ্ঞাসা করি তাহারা বলে জীবন্ত লোক অল্প, মৃতব্যক্তিই অনেক।" তখন বুদ্ধ তাঁহাকে জীবনের

অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার মনে প্রতীতি জন্মিল, তখন সান্ত্বনা লাভ করিয়া বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইলেন।

বৌদ্ধভিক্ষুরা একদিন বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভগবন্! সন্ন্যাসাশ্রমী ভিক্ষুরা স্ত্রীলোকদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে?"

বুদ্ধদেব কহিলেন—তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিও না।

—যদি তাহারা সম্মুখে আসিয়া পড়ে?

—তাদের দেখিয়াও দেখিও না, এবং তাদের সহিত বাক্যালাপ করিও না।

—যদি তাহারা আমাদের সহিত কথা কহে তাহা হইলে কি করিব?

—যদি কথা কহিতেই হয়, মনে কোন কুভাব না থাকে, পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্লিপ্ত থাকিবে।

বুদ্ধদেব আরও কহিলেন:—

"বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীকে মাতৃতুল্য, যুবতীকে ভগিনীতুল্য, অল্পবয়স্ক বালিকাকে দুহিতা সমান জ্ঞান করিবে।

"পরস্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করা অপেক্ষা তপ্তলৌহখণ্ড দ্বারা চক্ষু উৎপাটন করা ভাল।

"সাবধান! সংযমী হও, কামরিপুকে হৃদয়ে স্থান দিও না। রমণীসংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া তোমরা শ্রমণের ব্রত পালন করিবে।"

এইরূপে তাঁহার জীবনের অশীতি বৎসর গত হইল;

এই দীর্ঘকাল বিনা দুঃখে কষ্টে, বিনা সঙ্কটে অবাধে কাটিয়া গেল, এমন মনে করা ঠিক নয়। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার উপর দিয়া কত বিঘ্ন বাধা গিয়াছে, তিনি কত বিপত্তির মধ্যে পড়িয়াছেন বলা যায় না; তথাপি তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যপথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই। গৃহস্থেরা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবিচ্ছেদে তাঁহার উপর ক্ষেপিয়া উঠিয়া তাঁহার কত অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় আধিপত্য নাশ ভয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে কত ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাঁহার শিষ্য দেবদত্ত একবার তাঁহাকে যে বিপদে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এই জীবনী হইতে বুদ্ধদেবের নিত্য নিয়মিত জীবনকৃত্য আমরা কতকটা কল্পনা করিতে পারি,—কিন্তু শুধু কল্পনা নহে, অনেকানেক বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা তাহা বর্ণিত দেখিতে পাই। তিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কোন পরিচারকের সাহায্য ব্যতিরেকে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেন। তখন হইতে ভিক্ষার্থে গ্রামে যাইবার পূর্ব্বে যে সময়টুকু থাকিত, তাহা নির্জ্জনে ধ্যানে যাপন করিতেন। বাহির হইবার সময় হইলে তিনি ভিক্ষুকদের ন্যায় বসনত্রয় পরিধান পূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে কখনো একাকী, কখনও বা অনুচরসহ সন্নিহিত গ্রামে কিম্বা নগরে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার দেহ হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি বিনির্গত হইত। বিহঙ্গমের কলরবে এবং আকাশ হইতে মধুর ধ্বনিতে দিগ্বিদিক্ নিনাদিত হইত। তাঁহার শুভাগমনের নিদর্শন দৃষ্টে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ

বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, পুষ্পমালা উপহার লইয়া তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে বাহির হইত। তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ বাধিয়া যাইত যে, কে তাঁহার আতিথ্য করিবে। অনুগ্রহ করিয়া আজ আমার গৃহে পদার্পণ করুন, আপনার জন্য, আপনার অনুচরবর্গেয় জন্য আহার প্রস্তুত,—এই বলিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া, উপস্থিত জনের মধ্যে কোন গৃহস্বামী তাঁহাকে অনুচরবর্গসহ গৃহে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের আতিথ্য করিতেন। আহার শেষ হইলে বুদ্ধদেব সমবেত লোকসকলকে উপদেশ দিতেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ বা গৃহস্থের উপদেশ গ্রহণ করিত; আর যাঁহাদের তদপেক্ষা উচ্চাভিলাষ, তাঁহারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন। পরে উঠিয়া তিনি নিজ বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিতেন; সেখানে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত দিবসের গতাগত কার্য্যসকল স্থিরভাবে পর্য্যালোচনা করিতেন। তৎপরে দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ উপদেশ দিতেন "সত্যপরায়ণ হও, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। পৃথিবীতে বুদ্ধদর্শন দুর্লভ। বুদ্ধের উপদেশ লাভের সুযোগ অবহেলা করিও না।" পরে তাঁহার পুষ্পবাসিত কক্ষে গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতেন। সন্ধ্যার সময় ইচ্ছা হইলে স্নান করিতেন। তদনন্তর লোকেরা আশপাশের গ্রাম বা নগর হইতে আসিয়া তাঁহার বাসস্থানে সম্মিলিত হইলে পর, তিনি তাহাদের ধীশক্তি ও ধারণা অনুসারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন; তাহারা তাঁহাকে আপন আপন আধ্যাত্মিক অবস্থা জ্ঞাপন করিত; যাহার যাহা জানিবার ইচ্ছা, তিনি তাহা

পূর্ণ করিতেন; যাহার যে কোন বিষয়ে সংশয়, তাহা মিটাইয়া দিতেন। এইরূপে একপ্রহর রাত্রি কাটিয়া যাইত; পরে সকলকে সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে বিদায় দিতেন। অবশিষ্ট কাল কতক ধ্যান, কতক বা নিদ্রায় যাপন করিতেন, এবং প্রত্যূষে উঠিয়া কাহার কি আবশ্যক, কাহাকে কিরূপ উপদেশ দিতে হইবে, কি উপায়ে লোকের দুঃখ মোচন ও কুশল বর্দ্ধন করিবেন, এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দিবসের কার্য্য স্থির করিতেন।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে বুদ্ধের মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ তিন মাসের ঘটনাবলীর সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহা হইতে এবং অন্যান্য প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে, বর্ষার চারিমাস ছাড়া অবশিষ্ট কয়েক মাস তিনি প্রায় প্রত্যহ আট দশ ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাঁহার বল, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রবুদ্ধ হইবার পর প্রায় ৪৫ বৎসর তিনি শ্রাবস্তী, বৈশালী, রাজগৃহ, কুশীনগর, এই সকল প্রদেশে স্বীয় মতানুযায়ী ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়ান। এইরূপে দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাটনা হইতে উত্তর-পশ্চিম সরস্বতী পর্য্যন্ত এক দিকে প্রায় দেড়শত ক্রোশ, অন্য দিকে পঞ্চাশ ক্রোশ ব্যাপিয়া তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করেন এবং এই বিস্তীর্ণ প্রদেশে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, বহুবিধ জনপদের সমাগমে তিনি মানব-প্রকৃতি—মনুষ্যের ভাবগতি, রীতিনীতি, সুখদুঃখ, আশা ভরসা তলাইয়া বুঝিবার বিস্তর সুযোগ পাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

বুদ্ধদেবের যখন অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম, তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারের প্রারম্ভ হইতে চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর, তখন তিনি পাটলিপুত্র, আধুনিক পাটনা নগরের স্থানে গঙ্গা পার হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন রাজা অজাতশত্রুর মন্ত্রীগণ পাটলিপুত্রের দুর্গ নির্ম্মাণে ব্যস্ত, মগধের ভাবি রাজধানীর সেই প্রথম পত্তন। তাহার রাজ্যশ্রী সহস্রবৎসর স্থায়ী হইবে, বুদ্ধ এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যান। সেখান হইতে বৃজিজাতীয় লিচ্ছবিদের আবাস-স্থান বৈশালী গমন পূর্ব্বক অম্বপালী গণিকার আম্রবনে বিশ্রাম করেন ও নাগরিকদের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া গণিকার ভবনে গিয়া আহারাদি করেন। সেই সময় অম্বপালী তাঁহার উদ্যানগৃহ বৌদ্ধ সঙ্ঘে উৎসর্গ করে। বৈশালীর কূটাগারে বুদ্ধদেব তাঁর ধর্ম্মের সারতত্ত্বগুলি, যথা চারপ্রকার ধ্যান, চতুঃশমপ্রধান ধর্ম্ম, চারি ঋদ্ধিপাদ, আধ্যাত্মিক পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, অষ্টাঙ্গ মার্গ ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিলেন ও পরদিন ভিক্ষার পর বৈশালী ছাড়িয়া চলিলেন। বৈশালী হইতে তিনি ভণ্ডগ্রাম ও আর কতকগুলি গ্রাম অতিক্রম করিয়া অবশেষে কুশীনগর যাত্রা করেন—ইহা কপিলবস্তু হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কুশীনগর যাত্রাকালে 'পাবা' গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী আম্রবনে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। এই ভূমি চুন্দ নামক জনৈক কর্ম্মকার বৌদ্ধ-সমাজে দান করিয়াছিলেন। চুন্দ ভিক্ষুকদের জন্য তণ্ডুল ও বরাহমাংস প্রস্তুত করিল। প্রবাদ এই যে, সেই মাংস ভোজন করিয়াই বুদ্ধদেব পীড়িত হন এবং এই পীড়াতেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। অপরাহ্নে কুশীনগরের পথে কিয়দ্দূর চলিয়া

শ্রান্তিবোধ হওয়াতে তিনি বসিয়া পড়িলেন এবং আনন্দকে বলিলেন—"আমার বড় তৃষ্ণা লাগিয়াছে, জল আনিয়া দেও।" আনন্দ জল আনিয়া দিলেন। অল্প দূরে ককুত্থা নদী বহিতেছিল—তীরে পৌঁছিয়া নদীতে শেষবারের মত স্নান করিয়া লইলেন। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া এবং লোকে পাছে চুন্দের প্রতি দোষারোপ ও কটুবাক্য প্রয়োগ করে এই আশঙ্কায় আনন্দকে বলিলেন "আমার মৃত্যুর পর চুন্দকে বলিও সে বড়ই পুণ্যফল উপার্জ্জন করিয়াছে; জন্মান্তরে তাহার কল্যাণ হইবে। তাহার প্রদত্ত অন্নাহার করিয়া আমি মৃত্যুরূপ আরোগ্য লাভ করিলাম, নির্ব্বাণমুখে উপনীত হইলাম। আমার বুদ্ধত্বের পূর্ব্বে সুজাতার আতিথ্য সৎকার, আর এক্ষণে এই চুন্দার পক্কান্ন উপহার—এ দুইই আমার সমান আদরণীয়। এ বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে, কহিও যে এ কথা আমার নিজের মুখ হইতে শুনিয়াছ।" অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে কুশীনগরসমীপস্থ হিরণ্যবতী নদীতীরে পৌঁছিয়া গৌতম তথায় কিয়দ্দণ্ড বিশ্রাম করিলেন, এবং মল্লদের এক শালবনে গিয়া বৃক্ষতলে ডান কাতে শয়ান থাকিয়া মৃত্যুর পর আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে আনন্দের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় আনন্দের বিলাপধ্বনি শুনিয়া বলিলেন "ভাই আনন্দ, আমার জন্য শোক করিও না। আমি তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যার জন্ম তারই মৃত্যু—যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়—এমন কি কোন জিনিস আছে যাহার বিনাশ নাই? শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক, এক সময়ে প্রিয়জনদের ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। কিন্তু আমার

মৃত্যু হইল ভাবিও না। আমার প্রচারিত সত্যসকল, আমার উপদেশ ও অনুশাসন আমার পশ্চাতে রাখিয়া যাইতেছি—সেই সকল আমার প্রতিনিধি—সেই তোমাদের পথ প্রদর্শক। আনন্দ, তুমি অতি যত্নে আমার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছ—আশীর্ব্বাদ করি তোমার কল্যাণ হউক। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথে চল, বিষয়াসক্তি, অহমিকা, অবিদ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইবে। যতদিন আমার শিষ্যেরা শুদ্ধাচারী হইয়া সত্যপথে চলিবে, ততদিন আমার ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিবে। পাঁচ সহস্র বৎসর পরে যখন সত্যজ্যোতিঃ সংশয়-মেঘজালে আচ্ছন্ন হইবে, তখন যোগ্যকালে অন্যতর বুদ্ধ উদিত হইয়া আমার উপদিষ্ট ধর্ম্ম পুনরায় উদ্ধার করিবেন। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন "সে বুদ্ধের নাম কি?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন "মৈত্রেয়।"

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন বুদ্ধের প্রতি কাহারো কিছু সন্দেহ আছে কি না। তদুত্তরে আনন্দ কহিলেন—"গুরুদেব! আশ্চর্য্য এই যে, এত লোকের মধ্যে কাহারো একটি বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। সত্যের প্রতি, বুদ্ধের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি আমাদের সকলেরই বিশ্বাস অটল, কাহারো মনে তিলমাত্র সংশয় নাই।" পরে বুদ্ধদেব ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন "যার জন্ম, তার ক্ষয় ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—সত্যই মৃত্যুঞ্জয় হইয়া চিরকাল বাস করিবে। তোমরা যত্নপূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া আপন মুক্তিসাধন কর।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া নির্ব্বাণ রাজ্যে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার নির্ব্বাণের সঙ্গে

সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হইল—প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উঠিল। ব্রহ্মা সহাম্পতি এবং শক্রের কণ্ঠ হইতে আকাশবাণী হইল—"হায়! বুদ্ধদেব মর্ত্ত্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন—পৃথিবীর আলোক নিবিয়া গেল।"

তদনন্তর চক্রবর্ত্তী নৃপতির মরণোত্তর যে অন্ত্যেষ্টি-বিধান শাস্ত্রবিহিত, সেই বিধানানুসারে বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কুশীনগরের প্রধান প্রধান নাগরিক কর্ত্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে, তাঁহার দেহাবশেষ গ্রহণ করিতে অনেকানেক রাজ্য হইতে ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দগ্ধদেহের ভস্মরাশি আট ভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেকের উপর এক একটি স্তূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইল।

———